প্রথম আলো

তারিখ 26 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

যুক্তি তর্ক গল্প ◘ আবুল মোমেন

স্বল্পমেয়াদি হানিমুন ও ছাত্ররাজনীতি

দেশের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। আওয়ামী লীগ মানুষের মনের কথাটি বুঝে তা-ই নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রকাশ করে মানুষের মন পেয়েছে?

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ বিএনপির পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় চেয়েছে এবার। দেশের অধিকাংশ মানুষের এটাই ছিল অভিমত। যদি আওয়ামী লীগ মহাজোট না-ও করত, তবুও গণরায়ে খুব বেশি হেরফের হতো না বলেই মনে হয়।

কথা হলো, মানুষ কেন বিএনপিকে চায়নি আর কেনই বা আওয়ামী লীগকে চেয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সামনে বড় দুই দলের মধ্যে একটিকে না চাইলে অনিবার্যভাবে অপর দলটিকে চাওয়া ছাড়া আর বিকল্প থাকে না।

আওয়ামী লীগ ও তার ঘোর সমর্থক দাবি করতেই পারে যে মানুষ আওয়ামী লীগকেই চেয়েছে, চেয়েছে বলেই বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ভাবনার সত্য-মিথ্যায় না গিয়েও বাস্তব বুদ্ধিতে বোঝা দরকার যে এ রকম ভাবনায় বিপদের ঝুঁকি বেশি। কারণ আত্মতৃপ্তি ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিতে পারে তা।

সম্ভবত বাস্তবতা হলো, মানুষ একটা পরিবর্তন চেয়েছে। কী পরিবর্তন? দুর্নীতিগ্রস্ত অপরাধপ্রবণ সংঘাতময় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে মানুষ। চেয়েছে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আবহ। জোট সরকারের আমলে ক্ষমতাসীনদের লাগামহীন দুর্নীতি, দখলদারি এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও বিরোধী পক্ষের ওপর বেপরোয়া নির্যাতন চালানোর চিত্র প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষ তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই জবাব দিয়েছে মানুষ গত ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে। মানুষের সামনে তো আর বিকল্প ছিল না, তারা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের বিকল্প হিসেবে অনিবার্যভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটকেই ক্ষমতায় এনেছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও পরিবর্তনের ডাক দিয়েই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছিল। মানতেই হবে, শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবারের নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনা করেছেন, মানুষের প্রত্যাশায় সাড়া দিতে পেরেছেন এবং বলা যায়, মানুষের মনও জয় করতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ জোট সরকারের নেতিবাচক কাণ্ডকারখানাকে জবাব দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতির ওপর আশায় বুক বেঁধেছে। সেভাবেই তারা ভোটের দিন তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

এখানে বোধ হয় মনে রাখা ভালো হবে যে এ দেশের চির দুঃখী এবং বারবার বঞ্চনার শিকার সাধারণ মানুষের এই যে প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যাশা, তা তাদের চরম ভোগান্তির অভিজ্ঞতার কারণেই স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অর্থাৎ নতুন সরকার জনসমর্থনের যে বিরাট শক্তি পেছনে পেয়েছে, তা একেবারে নিঃশর্ত তো নয় এবং এত পোক্তও নয় যে তাদের আশা ও আস্থার ভিত বারবার ঘা খেয়েও অটল থাকবে। স্পষ্ট করে বলা ভালো, জনসমর্থনের এই ভিতটা অত্যন্ত বাস্তব কারণেই নড়বড়ে, অস্থায়ী, প্রায় পদ্মপাতার পানির মতো চঞ্চল।

অথচ সাধারণ মানুষের মতো বা সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন দেশের সচেতন মানুষ। কারণ দীর্ঘ ৩৭ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা সবাই ঘরপোড়া গরু। ফলে সরকারকে মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক ও বাস্তব কারণেই এ সরকার জনগণের গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মধ্যেই আছে। এবং অনেকটা বারাক ওবামার মতোই সরকারের হানিমুন সময় খুব দীর্ঘ হবে না, হবে অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী।

মানুষের এই মনস্তত্ত্বের আরও একটি কারণ হলো এবার মানুষের উপলব্ধি এবং জোরালো অভিমত হলো, অতীতের ব্যর্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আর ফেরা যাবে না। এটাই জনগণের সুদৃঢ় সদিচ্ছা। এটা সরকার উপলব্ধি করলে ভালো হয়।

এটা ঠিক, একটি সরকারের বয়স এক-দেড় মাস হতে না হতেই সমালোচনা করার তেমন অবকাশ নেই। কিন্তু পটভূমি ও প্রেক্ষাপট বিচার করলে মানুষের মনস্তত্ত্বের ঝোঁকটা বুঝতেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাস্তায় বা দেয়ালে

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে সবাই যে চিন্তিত তাতে সন্দেহ নেই

কান পাতলে জনমতের অস্থিরতা, ব্যাকুলতা টের পাওয়া যাচ্ছে। আশা করি সরকার ও সরকারপ্রধান অতিরিক্ত স্পর্শকাতর না হয়ে আত্মপক্ষে সাফাই গাওয়ার লাইনে না গিয়ে কীভাবে সমস্যার আবর্ত থেকে দেশ ও জনগণকে বের করে আনা যায়, সে চিন্তায় মনোযোগী থাকবে।

২.

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির ভবিষ্যৎ কী হওয়া উচিত, এ নিয়ে নানাজনের নানা মত আছে। তবে সবাই যে উদ্বিগ্ন, চিন্তিত তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দেশের মানুষ অন্তত বড় তিনটি ছাত্রসংগঠনের ইদানীংকালের রাজনীতির যে ধারা তার পক্ষে নয়। তারা এখানেও পরিবর্তন চায়।

মানতেই হবে, স্বাধীনতার পর থেকে, বিশেষভাবে দেশ সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের আওতায় চলে আসার পর থেকে ছাত্ররাজনীতিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তি, পেশিশক্তি, দখলদারির রাজনীতিতে ভাড়া খাটার প্রবণতা, টেন্ডারবাজি ও অবৈধ উপার্জন, বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও এলাকায় আধিপত্য কায়েম এবং তা ধরে রাখার জবরদস্তি, অস্ত্রবাজি, খুন-জখমসহ নানা অপরাধের বিস্তৃতি মিলে তিন বড় ছাত্রসংগঠনের রাজনীতিতে যে পচন ধরেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ কথাও বলা দরকার, লালন ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদ, তেল-গ্যাসসহ দেশের সম্পদ রক্ষার মতো আন্দোলনে দল-লীগ-শিবির এগিয়ে আসে না, আসে ছোটখাটো বাম প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ ছাত্ররা। বস্তুত পক্ষে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়ও অন্তত আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই স্বীকার করেন, ছাত্রলীগ এখন তাঁদের জন্য অ্যাসেট না হয়ে লায়াবিলিটি হয়ে পড়েছে। যুগের চাহিদা, পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং বর্তমান রোগ নিরাময়ের জন্য আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হবে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও একতরফা জাতীয়ভাবে নিজেদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সব কমিটি বিলুপ্ত ও কার্যক্রম বন্ধ করা। পাশাপাশি অন্যদের প্রতিও একই আহ্বান জানিয়ে জনমতের চাপটা তাদের ওপর দেওয়া যায়। এরপর তিন মাসের মধ্যে ছাত্রসংগঠনের জন্য কিছু নিয়মাবলি নির্ধারণ করে দিয়ে পুনরায় ছাত্রসংগঠন উন্মুক্ত করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যায়।

মূল কথা হলো, ছাত্রসংগঠনের জন্য কী নিয়মাবলি হওয়া উচিত? সবার ভাবনাচিন্তার জন্য কিছু পরামর্শ তুলে ধরতে চাই।

১. বাংলাদেশের যেকোনো ছাত্রসংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সংবিধানের মূল নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনায় বিশ্বস্ত হতে হবে, যার অর্থ হলো ছাত্রসংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও উদার মানবতাবাদী হতে হবে।

৩. কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন না হয়ে তার থাকবে স্বাধীন সাংগঠনিক ভিত্তি ও কর্মের পরিধি।

৪. প্রত্যেক সংগঠনের সদস্য হওয়ার ছক থাকবে, যা পূরণ করে নির্দিষ্ট চাঁদা দিয়ে নিয়মাবলি মেনে সদস্য হতে হবে। বছর শেষে সদস্যপদ নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

৫. প্রত্যেক সংগঠনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে, হিসাবপত্র রক্ষা করতে হবে, আয়ের অন্যান্য উৎস নির্দিষ্ট করা থাকবে। একটি ছাত্রসংগঠনের বার্ষিক বাজেটের সর্বোচ্চ সিলিং থাকবে এবং ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করা থাকবে।

৬. জাতীয়ভিত্তিক ছাত্রসংগঠনগুলো কেবল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে পারবে। কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্রসংগঠন থাকবে। তারা পরোক্ষভাবে জাতীয়ভিত্তিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে, তবে সরাসরি অঙ্গসংগঠন হওয়ার বিধান থাকবে না।

৭. নিয়মিত ছাত্র ব্যতীত কেউই কোনো ছাত্রসংগঠনের কর্মকর্তা বা সদস্য হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সেরও একটি সীমা থাকবে, তা হওয়া উচিত ২৬-২৭ বছর।

৮. পাবলিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে, পর পর দুবার ড্রপ দিলে বা একাডেমিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তিনি কর্মকর্তা হতে বা থাকতে পারবেন না।

৯. কেউ কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হলে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া অর্থাৎ অভিযোগকালীন সদস্যপদ স্থগিত থাকবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং শাস্তি ভোগ করলে ছাত্ররাজনীতির সুযোগ আর থাকবে না।

১০. কারও বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনসহ ছাত্র পীড়ন বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, শান্তি ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হলে অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সদস্যপদ স্থগিত থাকবে।

১১. কোনো ইস্যুতে আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠনগুলো যেমন মোর্চা গঠন করতে পারে, তেমনি বিভিন্ন ক্যাম্পাসভিত্তিক সংগঠনগুলোও নিজ নিজ পছন্দের সংগঠনের সঙ্গে বা আরও বৃহত্তর ঐক্যের জোট গঠন করতে পারে।

১২. গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ নিয়মাবলি কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য থাকলে চলবে না। যাতে এগুলো অনুসৃত হয়, তা দেখা এবং সামগ্রিকভাবে ছাত্রসংগঠনের ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কমিটি থাকতে পারে, যে কমিটি সংগঠনের নিবন্ধন দেবে, নবায়ন করবে, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেবে।

১৩. ছাত্রসংগঠনের কাজকর্মের মূল ক্ষেত্র হতে হবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, মানবসেবা ও জাতীয় স্বার্থের ইস্যু।

১৪. প্রত্যেক সংগঠনকে প্রতিবছর বার্ষিক কার্যবিবরণী ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পেশ করতে হবে।

১৫. ক্যাম্পাসভিত্তিক ছাত্রসংগঠনগুলো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের আওতায় থেকে সরকার অনুমোদিত সাধারণ নিয়মাবলির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

আমাদের দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটা, সমাজে নিয়ম ও আইনের প্রতি অবজ্ঞা-ঔদাসীন্য সৃষ্টি, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ আইনের ঠিকমতো প্রয়োগ না থাকা, ক্ষমতাবান অপরাধীদের দাপটের কারণে মামলায় সাক্ষী না পাওয়া এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া।

ফলে ছাত্ররাজনীতিকে বর্তমান ব্যাধি ও দূষণমুক্ত করতে হলে একদিকে যুগোপযোগী সঠিক নিয়মাবলির প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে আর অন্যদিকে রাজনৈতিক দল বা নেতাদের দিক থেকে বেআইনি কাজে ছাত্রদের ব্যবহার ও তাদের বেআইনি কাজকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

এ বিষয়ে ভাবার এবং কিছু করার এটাই সময়।

● আবুল মোমেন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।